উপসংহার

সাহিত্যে যে পরিবর্তন আসে তার প্রায় সিংহভাগটাই নির্ভর করে সমাজের বিবর্তনের ওপরে। নানা ধরনের সামাজিক অনুশাসনের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হয়। সমাজের যত রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন তার প্রায় সমস্তটাই দেখা যায় নারীদের কেন্দ্র করে। নারীরা শুধু সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা বলি-প্রদত্ত নন, গৃহের অভ্যন্তরে অন্দরমহলেও রয়েছে তাদের জন্য নানাবিধ শাসনবিধি এবং অনেক রকমের কথার ফাঁদ। আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন এই সমাজেরই একজন নারী এবং তাঁর লেখায় নারীদের কথাই সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজে শোষিত মানুষের একটা বড় অংশই ছিল নারীরা। অর্থ উপার্জনের সমস্ত দিকগুলো পুরুষেরা দখল করেছিল এবং ভবিষ্যতেও যাতে কোনরকমে নারীরা সে পথ অবলম্বন করতে না পারে সে দ্বারও পুরুষকেন্দ্রিক সমাজ রুদ্ধ করে রেখেছিল। অর্থাৎ শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদেরই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। নারীদের প্রবেশাধিকার সেখানে ছিল না। এই ব্যবস্থাটাকে বাড়ির বর্ষীয়সী মহিলারাও সমর্থন করতেন। আশাপূর্ণা দেবী নিজে ছিলেন এই পরিস্থিতির শিকার। তিনি নিজেও প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, অর্থাৎ সামাজিক প্রচলিত রীতির জন্য বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষালাভ তাঁদের বাড়ির মেয়েদের হয়ে ওঠে নি। বাড়ির অভিভাবিকা হিসেবে তাঁর ঠাকুরমার মনোভাব হল মেয়েদের লেখাপড়া শেখা নিষ্প্রয়োজন, এর ওপরে কথা বলা তাঁর বাবা-কাকা কারো ক্ষমতা ছিল না। যথারীতি কেউ এ নিয়ে চিন্তান্বিতও ছিলেন না। কিন্তু যেহেতু আশাপূর্ণা দেবীর মায়ের ছিল অসীম সাহিত্যপ্রীতি, আর তাঁর বাবা, মায়ের এই দিকটাকে সুনজরে দেখতেন, তাই বাবার উৎসাহেই বাড়িতে আসত বিভিন্ন লাইব্রেরীর প্রচুর বই ও পত্র-পত্রিকা। আশা পূর্ণা দেবীও ছেলেবেলায় দাদাদের বই পড়ে পড়ে অনেক কবিতা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। বই পেলেই দুরন্ত মেয়ে শান্তশিষ্ট সুবোধ বালিকায় রূপান্তরিত হয়ে যেত বলে বহু সন্তানের জননী সরলাসুন্দরী দেবী এই লোভটা ছাড়েন নি। সময় সুযোগ পেলেই মেয়ের হাতে গল্পের বই ধরিয়ে দিতেন। ফলে বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলেও সাহিত্যের অঙ্গনে বিচরণ থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি। বরং সুবিধার দিকটাই বেশি ছিল, বড়দের এবং ছোটদের সকলের বইই পড়ার তিনি সুযোগ পেতেন।

তথাপি আশাপূর্ণা দেবীকে যে দিকটা মানসিকভাবে পীড়িত করত তা হচ্ছে পুত্র-কন্যার মধ্যে বৈসাদৃশ্য। পুত্র-সন্তানের প্রতি প্রতিটি বাড়ির সদস্যদের প্রয়োজনানুযায়ী বিশেষ যত্ন-আত্তি অথচ কন্যা-সন্তানদের প্রতি প্রত্যেকের অসীম অবহেলা — যা নাকি প্রতিনিয়তই ঘটে যাচ্ছে। "ছেলেরা

যেন পরম মাণিক, মেয়েরা কিছুই নয়" — এই বোধটা বিশেষভাবে তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল বলেই হয়তো নারীদের দিকটাই তাঁকে ভীষণভাবে ভাবাত। আর সেই ভাবনার প্রতিফলনেই আমরা বেশ কিছু জীবন্ত প্রতিবাদী নারী চরিত্রকে তাঁর লেখনীতে বিকশিত হয়ে উঠতে দেখি। যে সময়ে নারীদের নিজেদের মান-অপমান এবং আত্মসম্মানবোধ বলে কোন কিছু ছিল না এবং সমস্ত রকমের অগ্রগতির পথ নারীদের সম্মুখে অবরুদ্ধ হয়ে থাকলেও তাতে নিজেদের বঞ্চিত ও অপমানিত বলে মনে করতো না — সে সময়েই 'সত্যবতী'র (প্রথম প্রতিশ্রুতি'র নায়িকা) মতো নারীর জন্ম হল আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীতে।

আশাপূর্ণা দেবী আজীবন অত্যন্ত সাধারণ একটি নারীর মতো জীবন যাপন করে এসেছেন। পনের বছর বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়ে যায় এবং স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ী-দেবর সকলের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করে গিয়েছেন। নিজে যখন গৃহিণী হলেন তখনও সন্তানদের প্রতিপালন, সংসার যাত্রা নির্বাহ, বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা — স্বহস্তে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করে এসেছেন। বিবাহের পূর্বেই কবিতা লেখা শুরু করলেও বিবাহের পরে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে শুরু করলেন উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে 'পত্নী ও প্রেয়সী' আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আশাপূর্ণা দেবীর রচিত প্রথম ছোটগল্প হিসেবে। এভাবেই তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব। সংসার জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রমাগত পরিণতি দেখা দিয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন —

> "বিচিত্র চরিত্র এই মানুষ জাতটাকে কে কবে চিনেছে? এ কত উল্টো পাল্টা উপাদান দিয়েই তৈরী। এর মধ্যে কত রং, কত লীলা, কত বিস্ময়! সে নিজেই জানে না কি জন্যে কী করে বসে। জানে না তার চেতনে অবচেতনে কোথায় কি আছে, তার 'মন' নামক বস্তুটা কী জটিলতার জালে আবদ্ধ।"
>
> *(পৃ. ৮ আর এক আশাপূর্ণা)*

রক্ষণশীলতা ও নানা সামাজিক অনুশাসনের জালে আবদ্ধ থাকা নারীদের মধ্যে কিভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটছে, নারীরা শিক্ষিতা, আধুনিকা হয়ে উঠছেন — অর্থাৎ নারীদের বিবর্তনও তাঁর চোখে পড়েছে। এই পরিবর্তনকে তিনি তাঁর মর্মে অনুভব করতে পেরেছেন, এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন এবং লেখনীতেও তাদের রূপ দিয়েছেন। কিন্তু এই পরিবর্তনকে দেখার জন্য তিনি কখনো বাইরে যান নি। তিনি নিজমুখেই বলেছেন —

> "আমি চিরদিনই চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী। আমার পৃথিবী জানলা দিয়ে দেখা।"
>
> *(পৃ. ১৫, ঐ)*

তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মনে নানা ধরনের বোধ ক্রমশঃ নানারূপে সত্য ও স্পষ্ট হয়ে প্রতিকায়িত হচ্ছে এবং সেগুলোই তাঁর রচনাকে ধীরে ধীরে পরিপক্ক করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর মনোভাব সম্পর্কে স্মরণযোগ্য হচ্ছে তাঁর নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারটি —

"I always think of the unhappy, the helpless women, but I do try to aviod writing about unhappiness in the physical sense, about hunger, poverty, unemployment, violence etc. I am more concerned with human relationships with the mental and emotional tensions created by society, with the hypocrisis and double - standards in society, with the contradictions between external appearances and the inner world. (A Brief Encounter with Ashapurna Devi : Shivani Banerjee Chakraborty, News Letter, School of women's studies, J. U. March, 2000)."

আশাপূর্ণা দেবীর আরো আগে থেকেই অনেক স্ত্রী সাহিত্যিকরা সাহিত্যাঙ্গণে পদার্পণ করেছেন, তাঁদের লেখনীতেও বাস্তব সত্য ও সমাজ চিত্র নানাভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর মতো অন্তঃপুরের অন্তঃপুরিকাদের অন্তঃস্থলে তেমনভাবে কেউ প্রবেশ করতে পারেন নি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

"জীবন পর্যালোচনার বিশিষ্টতায় আশাপূর্ণা দেবীই অগ্রবর্তিনী। ... লেখিকার জীবন নিরীক্ষার সত্যসার এই গৃহজীবনের মধ্যেই নিহিত আছে।"

(পৃ. ৩৩৯ — বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)

সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্তা লেখিকা নবনীতা দেবসেন তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, জাতীয় স্তরে এবং কখনও ভারতের বাইরেও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরেই পরিচিতির দিক থেকে আশাপূর্ণা দেবীর স্থান রয়েছে। দক্ষিণ ভারতে আশাপূর্ণা দেবীর এতটাই প্রভাব রয়েছে যে, কেরালায় অনেক দম্পতিরা তাদের কন্যাসন্তানের নাম পর্যন্ত 'আশাপূর্ণা' রেখেছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর জীবনে অনেকবার বাড়ি বদলের ঘটনা ঘটেছে। তিনি জীবনে অনেক শোক, কষ্ট, আঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন আবার অনেক সম্মান ও পুরস্কার লাভ তাঁকে উচ্চাসনে আসীন করেছে। কিন্তু জীবনের ঘটনার গতিপথ পরিবর্তনে বা উত্থান-পতনে তিনি চিরকাল থেকেছেন অবিচল। হর্ষ ও বিষাদকে মর্মে অনুভব করে উৎফুল্ল ও ব্যথিত হতেন, কিন্তু উচ্ছ্বসিত-উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন না। এই মনোভাবটা তখনই তৈরি হয় যখন মানুষ সমস্ত লোভ, লালসা, মোহ পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র নির্মল ও উদার মনের মানুষ হয়ে কর্মজগতে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। আশাপূর্ণা দেবীও ছিলেন তদ্রূপ। তিনি তাঁর কর্ম সম্পর্কে এতটাই আন্তরিক ছিলেন যে, প্রতিটি ঘটনা এবং চরিত্র তাঁর রচনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, যা নাকি পাঠক সমাজকে অন্তরে দোলা লাগিয়ে যায়। যে সমস্ত সাধারণ অন্তঃপুরিকারা সাহিত্যের পাতায় স্থান পেয়েছে, তাঁরা যে কখনও সাহিত্যক্ষেত্রে চরিত্র হয়ে উঠবে, তাদের মন-সমস্যা-দ্বন্দ্বও যে গল্পের উপাদান হয়ে উঠতে পারে, তা বাঙালী পাঠককুল এতদিন ভাবতেই পারেনি। আশাপূর্ণা দেবী প্রথম সকলের সম্মুখে এদের উপস্থিত করে বুঝিয়ে দিলেন পর্দার আড়ালে যারা রয়েছে তাদেরও ব্যথা-অভিমান-আবেগ-যন্ত্রণা রয়েছে। তাদেরও নিজস্ব স্বরূপ ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা নাকি সে সমস্ত চরিত্রদের পরিপূর্ণ মানবী করে তুলতে পারে। এইসব

নারীদের আত্মসচেতনতাবোধ এক একটি পরিবারের মধ্যে আলোড়ন তুলে দিতে পারে। আমরা 'তাসের ঘর' এ মমতাকে দেখি কেমনভাবে তার দীর্ঘদিনের সংসারকে এক লহমায় ভুলে গিয়ে অজানা জগতে একাকিনী বেরিয়ে পড়েছে। মমতার সামান্যতম অপরাধকে কেউ বুঝতে চাইল না, এমনকি তার স্বামীও নয়; জোয়ারের মত একটা মিথ্যা গল্পকে নিমেষে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সত্যি বলে দাঁড় করিয়ে দিল এবং সংসারের প্রতি মমতার সমস্ত অবদানের কথা ভুলে গিয়ে তাকে কুৎসিত চেহারায় মানুষের কাছে, সমাজের কাছে উপস্থাপিত করল। এই ব্যাপারটিও অন্দরমহলেরই একজন নারী তথা মমতার বিধবা ননদের দ্বারা ঘটেছিল। পরিণামে মমতার মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক প্রতিবাদী বিদ্রোহিণী নারী সত্তা, যা আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীকে এবং মানসিক পরিণামকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিল।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর রচনাতে বিধবা নারী চরিত্রগুলোকে উপস্থাপিত করেছেন। কারণ পরিবারে বিধবারা একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করত, যদিও সেটা শ্রেণিভেদে হত। যেমন - এক শ্রেণির বিধবা-নারী ছিল বাড়ির মেয়েরা, আর একদল ছিল আত্মীয়ারা। উভয়পক্ষই বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের শিকার হলেও বাড়ির মেয়েরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেই থাকতেন। কিন্তু আত্মীয়ারা সর্বদাই দয়ার পাত্রী হয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন। এরা সমাজের বুকে ছিলেন অপাংক্তেয়, সমস্ত আনন্দ উৎসব সুখভোগ বিলাস ব্যসন থেকে তাদের দূরে থাকতে হত। কিন্তু এদের মনেও থেকে যেত সংসারের সাধ, একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে প্রভাব বিস্তার করে ভাই-ভাজ-ভাইপোদের মধ্যেই নিজেদের পূর্ণতাকে পেতে চাইতেন। আর এদের ভালো-মন্দ উভয়প্রকার প্রভাবই বাকী চরিত্র এবং ঘটনাগুলোকে প্রভাবিত করত। বিধবাদের আহার-বিহার পর্যন্ত সংসারের অন্যান্য নারীদের দয়ার উপকরণ ছিল। যেমন **'ছিন্নমস্তা'** গল্পে আমরা দেখতে পাই বিধবা শাশুড়ীর ডাঁটা চচ্চড়ি খাওয়া নিয়ে নববিবাহিতা পুত্রবধূর ব্যঙ্গোক্তি, যা নাকি অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও অপমানজনক ছিল। 'স্বজাতি' গল্পেও দেখি সেই নারীকে — যেখানে শিবানী বিধবা না হলেও নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর পত্নী হিসেবে প্রায় বিধবার সমগোত্রীয় করে রাখা হয়েছে তাকে। মায়েদের চোখে একমাত্র সন্তানের শোকই বড় নয়; রোজগেরে সুউপায়ী পুত্রের দামই অনেক বেশি। এই দিকগুলো আশাপূর্ণা দেবী বাস্তবের কঠিন বাতাবরণ থেকে এত সুন্দরভাবে আহরণ করে আনেন যে, পাঠককুলের অপরিচিত চিত্র বলে মনে হবার কোন অবকাশই থাকে না। মাতৃহৃদয় শুধু যে চিরকল্যাণকামী, সহৃদয়, কোমলা হয় তাই নয়, আপাত স্নেহের অন্তরালে মায়ের নিজের আত্মতৃপ্তি চরিতার্থতার কথাই রয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর এই গল্পগুলোতে।

নারীর বহুরূপ চিত্রণের মধ্যে আর একটি দিক আশাপূর্ণা দেবী আলোকিত করেছেন তা হল নারীর ব্যক্তিসত্তার দিকটি। নারীরা অর্থের দিক থেকে স্বাবলম্বী নয় বলে যে তারা পুরুষতান্ত্রিক

সমাজের দেওয়া গালমন্দ, অপমান সব হজম করে সংসারে পড়ে থাকবে তা নয়। নিজের পছন্দ, ভালোলাগা, মন্দলাগা যে পরিবারের সম্ভ্রমের ওপরেই সর্বদা নির্ভর করবে তাও নয় — এ ধরনের প্রতিকূলতাকে জয় করেও কিছু নারীরা বেরিয়ে আসতে পেরেছে। 'ছায়াসূর্য' গল্পে আশাপূর্ণা দেবী ঘেঁটুর মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতাকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন — তার ভালোলাগাই যেন ধনগর্বীদের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। তার প্রেমিক পুরুষটির অসুস্থতা ও মৃত্যু ঘেঁটুকে আরো পরিপূর্ণ মানবী করে তুলতে সহায়তা করে। 'বৈরাগ্যের রং' গল্পে আত্মত্যাগী ভালোবাসায় উৎসাহী কোমল নারীর ভেতরে যে দৃঢ়চেতা একটি মানুষের জন্ম হল অথচ সেটা সমাজ সংসারে থেকেও সকলের চোখের আড়ালে রয়েছে তাকে উদ্‌ঘাটন করাতেই আশাপূর্ণা দেবীর স্বকীয়তা। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে সাহিত্যের আঙিনায় পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করেছে।

ব্যক্তিত্বের জাগরণই শেষ কথা নয়, ব্যক্তিত্ববোধকে স্বহস্তে স্তিমিত করে দিয়ে পুরানো চাল চলনে ফিরে যাওয়াও দেখা যায় আশাপূর্ণা দেবীর রচনায়। নারীদের স্বাধীনতা দেবার কথা, সমানাধিকারের সুযোগ দেবার কথা তিনি বারংবার বলেছেন যেমনভাবে আবার তেমনভাবে চিন্তিতও হয়েছেন প্রচণ্ড আধুনিকতার ঝোঁকে নারীদের মধ্যে অন্তঃসারশূন্যতা দেখা দেওয়ায়।

নারীর পরকীয়া প্রেমের উদাহরণও আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় রয়েছে। সংসারজীবনে আবদ্ধ হলেও মানুষের মন যে একই স্থানে আবদ্ধ থাকবে সে রকম কোন কথা থাকতে পারে না বলেই পুরুষদের মনের নানা স্থানে অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয়েছে অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্পে। সেদিক থেকে নারীদের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশাপূর্ণা দেবী বিশ্বাস করেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে তার পরিণাম কি হয় তার অনেক নিদর্শন উপন্যাস ও ছোটগল্পে রয়ে গিয়েছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা হল অন্দরমহলের বাসিন্দা, তারা বর্তমানে বহির্জগতে এলেও স্বাবলম্বীর সংখ্যা সেখানে পরিমিত। কিন্তু প্রতিটি সংসারের পুরুষকে জীবন ও জীবিকার সন্ধানে বহির্জগতে আসতেই হয়। এছাড়াও পুরুষদের সমস্তরকম ন্যায়-অন্যায় করার যেন একটা অলিখিত অধিকার রয়েছে; কিন্তু অনুশাসনের রকমারি গণ্ডী শুধুই তো নারীদের। তাই হয়ত নারীদের অন্যায়টা বেশি করে চোখে পড়ে। আবার আশাপূর্ণা দেবীই নারীর পরম স্নেহময়ী জননী রূপ, কল্যাণী বধূরূপের প্রতি চরম আস্থা জ্ঞাপন করেছেন, কারণ নারীরা স্নেহ কোমলতার আঁচল পেতে সমস্ত সুখ-দুঃখের ভার সহ্য করতে পারেন বলেই তো সংসার লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তারও পরে যদি কোন নারীর আলাদা কোন ভালোলাগা জন্মায় তাকে বাধা দেওয়া তো মনের গতিপথ রুদ্ধ করে দেওয়া। আশাপূর্ণা দেবী কোন রচনাতেই কি ঘটা উচিত বা অনুচিত তা বলেন নি, কিন্তু ঘটনাটি তুলে ধরেছেন। যেমন প্রলাপ, মৃত্যুবাণ, একটি ভাঙাচোরা গল্প, গুণ্ঠনবতী প্রভৃতি গল্পে নারীরা অপর পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়েছে।

মধ্যবিত্তের সংসারে অভাব, দারিদ্র্য হল নিত্যসঙ্গী। দারিদ্র্যের কশাঘাত কিভাবে মানুষের মনের কোমল বৃত্তিগুলোকে শুকিয়ে ফেলে রুক্ষতায় পূর্ণ করে তুলছে তারও নিদর্শন মেলে আশাপূর্ণা দেবীর রচনায়। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের জীবনচর্যার দিকগুলো যে ভয়াবহ পরিণতির দিকে যাচ্ছে, তার ফলে সমাজে ঘটছে অবক্ষয়, যা না কি অন্তঃপুরেও আলোড়ন সৃষ্টি করছে। দারিদ্র্যের ছোবলে জয়ন্তী আত্মহত্যা ('আত্মহত্যা') করে, রণক্লান্ত জয়ন্তীর সমস্ত মাধুর্য্য, সুষমা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যাদের সুখী রমণী হয়ে সংসারে লক্ষ্মীশ্রী বজায় রেখে চলার কথা তারা উল্টে সংসারকে শ্রীহীন করে চিরতরে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। যেমন হয়েছে 'তোমার মুখে আয়নায় ছায়া' গল্পে তপনের বোন ঝুন্টিরও। আত্মহত্যা না করলেও অসুস্থ মা-বাবার সংসারে সমস্ত কাজকর্ম সামলে রুগীর সেবা করে অবশ্যই দারিদ্র্যকে অঙ্গের ভূষণ করে। সেক্ষেত্রে তার পক্ষে কোমলতা, সেবাপরায়ণতা যে বজায় রাখা সম্ভব নয়, সেটা আশাপূর্ণা দেবী অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে অনুভব করেছেন। প্রাণশক্তি ছাড়া যেমন জীবন অচল, তেমনি বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপাদানের অভাবেও জীবনে ছন্দপতন ঘটে থাকে। অভাবের তাড়নাগুলো নারীদের ওপর আরো বেশি প্রভাব বিস্তার করে। তাদের মনে, চেহারায় সেই ছাপটা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। অনেক পরিবারের অধঃপতন এবং ধ্বংসের জন্যও পরিবারের নারীদেরই দোষারোপ করা হয়। পারিবারিক জীবনে বিড়ম্বনার প্রতীক হিসেবে 'অঙ্গার' গল্পের 'নতুন বৌ' একটি জীবন্ত উদাহরণ। 'অপরাধ' গল্পে কল্যাণীও ধনী দেওরের নিকট স্বামীর সম্মান রক্ষার্থে দেওরেরই জামার সোনার বোতাম চুরি করে অতিথি সৎকার করে। এতে কল্যাণীর যে অব্যক্ত হৃদয় যন্ত্রণা তাকে দগ্ধে দগ্ধে মারছে সেটাই আশাপূর্ণা দেবীর মূল প্রতিপাদ্য। কল্যাণী এবং নতুন বৌ এর মতো নারীদের সম্পর্কে প্রচলিত রূপের মূর্ত প্রতিবাদই শুধু নয় বরং এরা একে অপরের পরিপূরক। নারীদের এই সংবেদনশীলতা আশাপূর্ণা দেবীর মতো অন্য এক লেখিকা নবনীতা দেবসেনকেও ভাবায়।

ডঃ সরোজ মোহন মিত্র আশাপূর্ণা দেবীর রচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন —

> "সাংসারিক জীবনে কত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কত সামান্য ঠোকাঠুকি, কত বিচিত্র তার সমস্যা কিন্তু যত তুচ্ছ সেই ঘটনাই হউক না কেন তাকে কেন্দ্র করে যে কত দীর্ঘশ্বাস, কত চোখের জল পড়ে আশাপূর্ণা দেবী সেই দিকেই বেশি লক্ষ্য রেখেছেন।"
>
> *(পৃ. ২৭৫, বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প)*

পাঠক সমাজের চোখের সামনে যা ঘটে সেগুলো সাধারণ মানুষ শুধুই ঘটনা বলে মনে করে, কিন্তু অনুভূতিপ্রবণ আশাপূর্ণা দেবী তাকেই গল্পের উপজীব্য করে সাহিত্যের পাতায় তুলে আনেন বলে চেনা জিনিসকে নতুনরূপে সকলেই খুঁজে পান। পাঠকদের প্রত্যাশা যেন তাকে ঘিরে তাই বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ তাঁর মধ্যে পাওয়া যেত জীবন সম্পর্কে দৃঢ় ও শাশ্বত উপলব্ধি। তিনি যখন প্রথম জীবনে লিখতে শুরু করেন অর্থাৎ যে বোধ তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দিত — তা আশাপূর্ণা দেবীর

লেখার প্রেরণা হলেও তিনি সেখানে থেমে থাকেন নি। নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজ যেখানে নতুন নতুন সমস্যা, আন্দোলন ও আবিষ্কারের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হচ্ছে তার ঢেউ এসে অবরুদ্ধ অন্দরমহলের দ্বারেও আঘাত করছে। তাই আশাপূর্ণা দেবী যে অধিকার হীনতার অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ অসহায়, নিরুপায়, নিষ্পেষিত মেয়েদের কথা বলতেন তাদের সেই দুঃসহ অবস্থা অনেকটাই ঘুচেছে। সেই নারীরাই শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে কর্মজগতে প্রবেশ করে নিজের সম্মানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করছে। মানুষ হিসেবে সমাজের দুঃখ-সুখের একজন শরিক হতে পারছে। সংসারে শুধু হাঁড়ি সামলানো নয়, হাঁড়ি চড়ানোর মতো গুরু দায়িত্বও পালন করছে। কারণ, ততদিনে মেয়েরা বুঝতে পারছে পরিবারের সুশৃঙ্খলভাবে পথচলার মধ্যে তাদের অনেক কায়িক পরিশ্রম থাকে, কিন্তু যেহেতু সেখানে অর্থের কোন সংযোগ নেই, তাই সে পরিশ্রম অর্থহীনই থেকে যায়। এর ফলেই নারীদের মধ্যে স্বাবলম্বী হবার চেতনার সঞ্চার ঘটেছে। আশাপূর্ণা দেবী তার ত্রয়ী উপন্যাসে নারী জাগরণের কারণ থেকে শুরু করে এর পরিণাম পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। লেখিকার উপরোক্ত মানসিকতা থেকে দেখতে পাই অনেক গল্পেই নারীরা গৃহগত পরিবেশ থেকে বহির্জগতে এসে কর্মের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। যেমন — 'না', 'ব্রহ্মাস্ত্র', 'দৃষ্টি', 'একটি ফুটো পয়সার জের', 'সিঁড়ি', 'দাসত্ব' প্রভৃতি। আশাপূর্ণা দেবী নিজেও চেয়েছিলেন নারীরা এভাবে কর্মজগতে প্রবেশ করুক।

আশাপূর্ণা দেবী নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার যে কথা বলেছেন তার পাশাপাশি এও বলেছেন যে, কল্যাণী ও শ্রীময়ী মূর্তিতে ঘরের শান্তি-শৃঙ্খলাকেও বজায় রাখতে হবে। কারণ গৃহে শান্তি বিরাজ করলেই কর্মজগতে এবং দেশেও শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। আশাপূর্ণা দেবীর এই মনোভাবের প্রতি আলোকপাত করে নিতাই বসু বলেছেন —

> "আশাপূর্ণার দৃষ্টিতে যেহেতু নারীই পৃথিবীর শ্রী ও উজ্জ্বলতার প্রতীক তাই স্নেহে সেবায় ক্ষমায় আত্মত্যাগে স্বার্থত্যাগে তাকে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে। নারী হল মানুষ গড়ার কারিগর।"
>
> *(পৃ. (ix) ভূমিকা, আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড)*

পৃথিবীকে সৌন্দর্য চেতনায় বিকশিত করে তুলে আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডল গড়ে সুন্দর একটি ধ্যান গম্ভীর শান্ত পরিবেশ রচনা করে নিতে হবে নারীকেই, আর সেজন্যে প্রথমে নারীকে হতে হবে ঈশ্বর বিশ্বাসী। আশাপূর্ণা দেবীর পুত্রবধূ, নূপুর গুপ্ত বলেছেন —

> "মানুষের শুভবুদ্ধির প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাসের উৎস কিন্তু তাঁর অবিচল ভগবৎ বিশ্বাস — যা তাঁকে আজীবন সমস্ত শোক-তাপ-সমস্যার দুর্যোগে আশ্রয় দিয়ে মনোবল বাড়িয়েছে।"
>
> *(পৃ. (xii) আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলী প্রথম খণ্ড)*

তিনি একজন মহৎপ্রাণ মানুষ চেয়েছেন ঠিকই কিন্তু, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটছে। আশাপূর্ণা দেবী নিজেও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে তাঁর চিন্তা চেতনাকে

আধুনিক জীবনকেন্দ্রিক করে তুলেছেন। এর ফলে তাঁর চোখে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত ধরা পড়েছে তা পরিবার, মানুষের মন বা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে একেবারে আদর্শের দ্বারে উপনীত হয়েছে। তাই আশাপূর্ণা দেবী নিজেই বলেছেন —

> "আজকের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের মেয়েরা অনেক পাচ্ছে, তবু আগের যুগের মেয়েদের মতোই কানাকড়িটুকুও সামলাতে চাইছে।"
>
> *(পৃ. (x) — ভূমিকা — রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড)*

ধীরে ধীরে নারীদের মধ্যে পরকে আপন করে নেওয়া এবং ভালোবাসার গভীরতাটা যেন ক্রমশঃ স্বল্পাকার ধারণ করছে। যেমন — 'স্বাধীনতার সুখ', 'পাকা ঘর', 'সত্যাসত্য', 'শাড়ী মাহাত্ম্য', প্রভৃতি গল্পে নারীদের যে দিকগুলো ধরা পড়েছে তাই আশাপূর্ণা দেবীকে চিন্তান্বিত করে তুলেছে; তাঁর স্বপ্ন, আদর্শ ভ্রষ্ট হতে চলেছে বলে। মেয়েদের সম্পর্কে আশাপূর্ণা দেবীর আর একটি বাস্তব ধারণা ছিল যে, মেয়েরা মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। কারণ, বধূ নির্যাতনের মতো ভয়ংকর ঘটনাগুলো শুধুমাত্র স্বামীদের জন্য ঘটে না, মূল ভূমিকায় কোন না কোন নারীই বর্তমান। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য —

> "কখনও কখনও বাহিরের আগন্তুক আসিয়া পরিবারের আভ্যন্তরীণ সংঘাতকে আরও তীব্র ও জটিল করিয়া তোলে। এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশে জীবনের যে রূপ দেখা দেয় তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও বিকৃত। এমনকি উদার, আদর্শবাদী মনও এই গ্লানিময় পরিবেশে বৃথা সংগ্রামে আত্মক্ষয় করে ও সহজ, প্রসন্ন সার্থকতা হইতে বিচ্যুত হইয়া এক চিত্তদাহকারী দাবানলে সমস্ত সুন্দর ও সুকুমার বৃত্তিকে ঝলসাইয়া ফেলে।"
>
> *(পৃ. ৩৪০ — বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)*

যে সময়ে নারীরা সংসারে অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে সে সময়ে তাদের মধ্যে পাবার নেশাটা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে ফলে তখন নিজেকে একেবারে নিজের মতো করে না পাওয়া পর্যন্ত যেন সাধ মিটছে না। পরিবারের অন্যান্যদের ভালোবাসা, আন্তরিকতা তখন তিক্ত ও কটু বলে মনে হয়। এভাবেই অখণ্ড সংসারটা ভেঙ্গে একটা খণ্ডচিত্রে রূপান্তরিত হল। যার মধ্যে ফুটে উঠল সংসারের কর্তৃত্বের প্রতি অবমাননা, নিজের চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা এবং সেই চাহিদাকে পূর্ণ করে তোলার দুঃসাহস। এ প্রসঙ্গেও শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> "আজ বাঙালী পরিবারের ইহাই একটি সাধারণ, মর্মান্তিকরূপে সত্য চিত্র। বিশেষতঃ আধুনিক যুগে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উগ্র আতিশয্য ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশের প্রতি অসহিষ্ণুতার ফলে এই মতানৈক্য তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া সাংসারিক শান্তিকে বিধ্বস্ত করিতেছে।"
>
> *(পৃ. ৩৪১ — বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)*

আধুনিক নারী স্বাধীনতা নারী কোমল বৃত্তিগুলির বিনাশ ঘটিয়ে তাকে আত্মসুখপ্রবণ করে তুলেছে।

আশাপূর্ণা দেবী নারীদের অন্যান্য দিকের মতো অভিনয় ক্ষমতার দিকটির কথাও উল্লেখ করেছেন। যে নারী যতবেশি অভিনয় পটু তার সুনাম, খ্যাতিও যে ততবেশি তা তিনি মানেন। জায়া

ও জননীরূপে নারীরা বিরাজিত হয়ে পূর্ণ ও তৃপ্ত হলেও কিন্তু সেই পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে অভিনয় দক্ষতার ওপরেই। অভিনয়কে মূলধন করে নারী যতদিন চলতে পেরেছে ততদিন সংসারের একূল-ওকূল উভয়দিকই বজায় থেকেছে। নিজের সুখ আলাদা করে পেতে চায়নি। কারণ নিজের দিকে তাকালেই চরিত্রটির অভিনয় ক্ষমতা লোপ পেয়ে যাবে। আর নারী যদি পক্ষপুট বিস্তারিত করে সংসারকে অভিনয়ের ছলনায় আবৃত করে না রাখে তবে তো সেই সংসার হাড় মাস আলাদা হয়ে অস্থিচর্মসার হয়ে পড়বে। তাই এই গুণটিকেও আশাপূর্ণা দেবী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেক গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অভিনেত্রী' গল্পে অনুপমার পিতা, শ্বশুর, স্বামী এবং পরবর্তীকালে পুত্রের সঙ্গেও সমানভাবে অভিনয় করে গিয়েছেন। অনুপমার কথায় প্রত্যেকে যথেষ্ট খুশী হয়েছে এবং সকলেরই তাকে মনে হয়েছে বড্ড আপনার জন। নিজের সম্পর্কে যখন নিরাসক্তি জন্মায় একটা মানুষ তখনই সকলের মনের সন্ধান রেখে চলতে পারে। অনুপমারও তাই মনে হত, তার ফলে অভিনয়টাই যেন তার কাছে একটা নেশার মত হয়ে গিয়েছিল। আজন্মকাল তিনি সকলের বিশ্বাসের আশ্রয়স্থল হিসেবে ছিলেন এবং পুরুষ জাতির নানা রূপকে অভিনয়ের ছলাকলায় ভুলিয়ে শান্ত রেখেছেন। শুধু অনুপমাই নয় 'অনাচার' গল্পে সুভাষ কাকীমা বিধবা হয়েও বৃদ্ধ, অসুস্থ শ্বশুরের মনে নতুন করে আর পুত্রশোকের ব্যথা দিতে চাননি বলে নিজে সধবার সাজ বজায় রেখে সেইমতো অভিনয় করে যান। তার সেই অভিনয় সমাজে নিন্দিত হয়েছিল। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী মনে করতেন নারী মাত্রেই অভিনেত্রী। অনুপমা সমস্ত নারীর প্রতীক হয়ে গল্পের একটি চরিত্ররূপে দেখা দিয়েছে। সমস্ত কিছুই যেমন একটা স্থানে গিয়ে স্তিমিত হয় অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাই। নারীরা সকলের মনে শান্তি স্বস্তির যোগান দিতে গিয়ে নিজেকে ভুললেও বর্তমান জগতে নারীরা আর নিজেকে ভুলে থাকতে চায় না। নদীর মতো আপন গতিতে পথ চলতে গিয়ে প্রথমেই ছেড়ে গেল অভিনয়কে। কারণ এই সমাজের নানা রীতি-নীতি-সংস্কার-ধর্মের নামে অনুশাসন তাদের নিকট অসহনীয় হয়ে উঠল। নিজেদের অন্তরে বন্ধনদশার যে করুণ অবস্থা উপলব্ধি করতে পারল তখনই তারা এই যন্ত্রণাকর যুগকে আর মেনে নিতে পারল না, এর অবসান চাইল। গড়ে উঠল নারীর মধ্যে আত্মমর্যাদা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা।

আশাপূর্ণা দেবী শিল্পী হিসেবে নির্মমভাবে সত্যকে উন্মোচিত করেছেন। আশাপূর্ণা দেবী ছোটগল্পের আঙিনাতে দীর্ঘদিন বিচরণ করেছেন। তিনি প্রথম যখন ছোটগল্প লেখা শুরু করেন তখনও তাতে যথেষ্ট গ্রন্থন নৈপুণ্য ধরা পড়ে না। এ প্রসঙ্গে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> 'আশাপূর্ণার গল্পের প্লট গঠন যে সর্বত্র নিখুঁত ও আঁটসাট তা বলা যাবে না। কারণ তিনি গল্প লেখেন না, গল্প বলেন। তাঁর রচনার মধ্যে যেন কোন কথকঠাকুর লুকিয়ে আছেন, অথবা ঠানদিদি।"
>
> *(পৃ. (xvii) ভূমিকা — রচনাবলী প্রথম খণ্ড)*

গল্প লিখতে গেলে গল্প রচনার বৈশিষ্ট্যগুলোর যথাযথ বিকাশের দিকে যতটা নজর দেওয়া প্রয়োজন

মনে করতেন তার চেয়ে কি বলতে চাইছেন তিনি — সেটাই তাঁর নিকট বেশি গুরুত্ব পেত। তাই এককথায় তাঁর রচনাকে বলা যায় বক্তব্য প্রধান। মানুষের জীবনের সমস্যাগুলো তাঁকে ভাবিত করত, কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ আবিষ্কার তাঁর চিন্তার বিষয় নয়, তাই তাঁর রচিত গল্পগুলো সমস্যা প্রধানও বটে। সমস্যা বিজড়িত এই বিষয়গুলো প্রত্যেকটি সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষের হৃদয়কে আলোড়িত করে তুলত আবেগে, ব্যথায় ও ভাবনায়। কারণ, গল্পগুলো পাঠ করার পর দেখা যেত যেন পাঠকের একেবারে পাশের মানুষটির কথা বলা হচ্ছে। যাকে চোখের সামনেই এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু এভাবে যেন তার সম্পর্কে ভাবা হচ্ছিল না। গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে যে চরিত্র থাকে এবং তার যে সমস্যা গল্পে বিকশিত হয়ে ওঠে তার ভেতরেও যে মানবিক কোন আবেদন থাকতে পারে লেখিকা তা দেখিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত যেন অন্যান্যদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন 'অনাচার' গল্পে সুভাষ কাকীমা যে তার অসুস্থ বৃদ্ধ শ্বশুরের কথা ভেবে নিজের সমস্ত কষ্ট, দুঃখ শোককে বুকে চেপে রেখেছিলেন সেটা সমাজের সকলের চোখ এড়িয়ে গেছে, প্রাধান্য পেয়েছে সুভাষ কাকীমার সধবার সাজ পোষাক, খাওয়া-দাওয়ার সুখ বজায় রাখার চেষ্টাটাই। কিন্তু স্বামী বিয়োগ ব্যথার মত কষ্টকেও যে একটা মহৎ উদ্দেশ্যে চেপে রেখেছেন — সেটা চাপা পড়েই থাকত পাঠক সমাজের কাছেও, যদি না আশাপূর্ণা দেবী এই দিকটাতে আলোকপাত করতেন। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় তাঁর রচনাগুলো বাস্তব ঘটনা প্রধান।

আশাপূর্ণা দেবীর রচনা ভাবাবেগবর্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত, অসীম মমতায় পরিপূর্ণ দৃঢ়তার, ঋজুতার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি নিয়ে স্বমহিমায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আশাপূর্ণা দেবীকে প্লট খুঁজতে কোথাও যেতে হয় না বা কোন চিন্তা ভাবনার জগতেও ডুব দিতে হয় না। গৃহকর্মে সুনিপুণ দক্ষতায় সকলের সাথে বিরাজ করলেও মনোজগতে যে একাকী বিচরণ করতেন তাই তাঁকে সকলের চেয়ে আলাদা করে রাখত। এই আত্মমগ্নতা তাঁকে চতুপার্শ্বের ঘটনাগুলোকে অনুভব করতে এমনভাবে সহায়তা করত, যার ফলে মনে হত তিনি যেন ধূর্জটির তৃতীয় নয়নের মতো ঘরে বসেও অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। এই অনুভূতি থেকেই তৈরি হয় চরিত্রগুলো। বাস্তবের সমস্যাগুলো আর চরিত্রগুলোকে তিনি এতটাই পাশাপাশি রেখে লিখতে শুরু করেন যে চরিত্রগুলো প্রত্যেকে যেন রক্তমাংসের মানুষ হয়ে পাঠকের চোখের সম্মুখে চলাফেরা করে। ঘটনার বাস্তব সত্যতা এবং বক্তব্যের গভীরতা নির্ভর করে চরিত্রের বিকাশের ওপর। চরিত্রকে সঠিকভাবে অত্যন্ত দরদ দিয়ে আশাপূর্ণা দেবী প্রথমে ভাবতেন এবং সেই চরিত্রকে ঘিরে প্লট গড়ে উঠত ও চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতেই তিনি সংলাপ ও ভাষার সুপ্রযুক্ত ব্যবহারও করেছেন। স্বভাবতই তিনি যেহেতু নারীকেন্দ্রিক বিষয়কেই রচনায় স্থান দিতেন তাই তাঁর রচনাতে নারী চরিত্রগুলোই সজীব, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই হিসেবে তাঁর রচনায় পুরুষ চরিত্ররা বেশ দুর্বল, ভীরু; আবার কখনো বা একগুঁয়ে জেদী ও স্থূল। কোন বিশেষ

ছকে আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে ধরা যায় না। কারণ কোন গতানুগতিকতা লেখিকাকে ভাবাবার সুযোগ দেয় না। তিনি মনে করতেন যে, তিনি মূলতঃ চরিত্রকেই ভাবেন, আর তাই তাঁর রচনা হচ্ছে চরিত্র প্রধান। কারণ, মানুষের মনের অভ্যন্তরে যে সংস্কারের শিকড় এবং অহংবোধ প্রোথিত রয়েছে — তাই মানুষকে চালিত করে। আশাপূর্ণা দেবী এই বিষয়টা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই মানুষের দু'একটা সংলাপেই তাদের প্রকৃতিকে বুঝতে পারতেন। আর তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা প্রত্যেকেই অভিনবত্বের এবং সতেজতার দাবী রাখে। এই চরিত্রগুলোকে সার্থক করে তুলতে গিয়ে যে প্লট তৈরি হত, তাও হত অভিনব। আবার এ সমস্ত চরিত্রের কেউ বা সামাজিক অনুশাসনে গড়া — যেমন, 'পরাজিত হৃদয়', আবার কেউবা প্রকৃতির শাসনে শাসিত — 'ভয়'। চরিত্রের কথা বলতে গিয়েও কতকগুলো গল্পে ব্যক্তিচরিত্র বিকশিত হয়ে যুগচরিত্রে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ এমন এক একটি চরিত্র রয়েছে যারা একটা যুগের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে। আশাপূর্ণা দেবী চরিত্রদের মনের কথা বলতে গিয়ে কখনো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় ডুব দেননি। ফলে চরিত্রগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব, দোলাচলতা, নিজের অন্তরের গহনে ডুবে গিয়ে মুক্তোর সন্ধানের প্রয়োজন হয়নি বলে তাদের আত্মমগ্ন হয়ে নিজের কথা আত্মকথন রীতিতে বলে যাবার প্রয়োজনও হয়নি। অর্থাৎ আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্ট চরিত্ররা, বিশেষত নারীরা সমাজের যে স্থানে এবং যে যুগেই অবস্থান করুক না কেন, তারা নিজেদের ন্যূনতম মর্যাদা, আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়েই এক একজন বিদ্রোহিনী, ব্যক্তিত্বময়ী, আত্মসচেতন নারীতে পরিণত হয়েছেন।

আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন নগর সভ্যতাকেন্দ্রিক জীবনের মানুষ। তাই তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলোর মধ্যেও একান্তভাবেই নাগরিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর রচনায় পল্লীপ্রকৃতি উঠে এলেও পার্শ্বপটভূমিকা ও মূল গল্পের পরিপূরক হিসেবে এসেছে। যদিও কোন গল্পের পটভূমিকা রচিত হয়েছে পল্লীগ্রামে, সেখানে কিন্তু চরিত্র বিকাশই মুখ্য হয়ে উঠেছে, পল্লীগ্রাম হয়ে রয়েছে নিতান্তই গৌণ (পত্রাবরণ)। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের কথাই তিনি বারংবার বলে গিয়েছেন। একান্নবর্তী ঘুণধরা অবক্ষয়িত সংসারগুলোর কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রায় প্রতিটি গল্পেই ভগ্নদশাগ্রস্ত অট্টালিকাকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পরিবারের সকলে একটি স্নেহমায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থেকে সাজিয়ে গুছিয়ে বসবাস করার স্মৃতি চর্বণ করে বর্তমানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করা, মূল কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করে কেন্দ্রবিন্দু থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতার যে চিত্র তাকেই আশাপূর্ণা দেবী 'থীম' হিসেবে তাঁর ছোটগল্পের ক্যানভাসে আঁকতে চেয়েছেন। এ অবস্থায় আর পারিবারিক ঐতিহ্য, অট্টালিকার ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে তারা মনোযোগী নন। ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকা বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষয়িষ্ণু চিত্রটিকে আশাপূর্ণা দেবী 'থীম' হিসেবে ব্যবহার করেন। এতেই ধরা পড়ে অত্যাচারিতের পরিবর্তনের চিত্র। পূর্বে যেখানে ছিল অশিক্ষিতা, স্থূল অত্যাচারী শাশুড়ীদের অত্যাচারের যুগ (ছিন্নমস্তা), পরে সে

স্থানে আসে শিক্ষিতা, সূক্ষ্ম ভাবে অত্যাচারী শাঁসালো পুত্রবধূদের যুগ (ঘূর্ণমান পৃথিবী)। অর্থাৎ নাগরিক চেতনাসম্পন্ন আশাপূর্ণা দেবী নিজের মতো তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোকেও যে মনেপ্রাণে, অন্তরে-বাহিরে আধুনিক সুস্পষ্টতার প্রতিভূ করে গড়ে তোলেন তাই বোঝা যাচ্ছে। তাই তিনি কখনো কারো পক্ষ নিয়ে কথা বলেন না। নিরপেক্ষ, নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টিই তাঁকে সত্য চিত্র উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করে। এতে কারো জন্য কোন পক্ষ অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না। সত্যের স্বরূপেই উঠে আসে অত্যাচারী আর অত্যাচারিতের প্রকৃত চিত্র, তা কখনো পুত্রবধূ, কখনো শাশুড়ী, কখনো কোন পুরুষ — যেই হোক না কেন। অর্থাৎ কোন সংস্কার, কোন ধর্মীয় ছুৎমার্গ, কোন অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার — কোন কিছুই তাঁর রচনার ও চরিত্রের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি।

এইসব চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলতে আশাপূর্ণা দেবীর ব্যবহৃত ভাষাগুলো বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে। নারীদের মুখে পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা, সংলাপ, প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার তাদের জীবন্ত করে তুলেছে।

ছোটগল্পের উদ্ভব হবার পর অগ্রসর হতে হতে তা যখন যৌবনে উপনীত হল, তখন যৌবনের নন্দনকাননে অনেককেই বিচরণ করতে দেখা গেল। তাদের মধ্যে যেসব ছোটগল্পকার আশাপূর্ণা দেবীর সমকালীন তাঁরা প্রায় সকলেই সমাজ, দেশ, প্রকৃতি, মৃত্যু চেতনা, রাজনীতি, অসহায় আদিম প্রজাতিদের ব্যথা-বেদনা ও জীবনযন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছেন। প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব অনুভূতি, মনন, বাস্তব অভিজ্ঞতা, বোধ থেকে প্রকৃত সত্যের রহস্যকে উন্মোচিত করেছেন। উপরোক্ত দিকগুলো নিয়ে উদ্ভুত যে সমস্যা সেগুলো প্রতিটি মানুষকে, রাজনৈতিক মহলকে ভাবায় এবং সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠকসমাজও এসব বিষয় অবগত হতে পারে। সুবোধ ঘোষ, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, প্রমুখরা প্রায় সকলেই সমাজের যে স্থানটি স্পর্শ করে গেছেন তা হচ্ছে মধ্যবিত্ত সমাজ। মধ্যবিত্ত সমাজের টানা-পোড়েন, উত্থান-পতন, তাদের জীবন সংগ্রাম, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু এবং সর্বোপরি তাদের নিয়ে শাসক গোষ্ঠীর যে অত্যাচার এবং রাজনীতির খেলা চলে — এই বিষয়গুলোই হচ্ছে এই ছোটগল্পকারদের রচনার মূল উপজীব্য। সমাজের গভীর ক্ষতস্থানগুলো যেগুলো সমাজকে আরো বিষাক্ত করে দিয়ে কিছু সংখ্যক মানুষের যেন তাকে আরো দুর্গন্ধময় করে তোলার দিকেই প্রবণতা বেশি রয়েছে। ফলে আদর্শভ্রষ্ট সমাজ জীবনের প্রগতির সঙ্গে সমান পদক্ষেপে সবসময় চলতে ফিরতে পারছে না বলে তা কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হচ্ছে। আর তাই উন্নয়নের চিন্তাধারায় শক্তিশালী প্রধান একটি স্রোত নির্মিত হচ্ছে না। অর্থাৎ এই সময়ের বহু বিচিত্র সমস্যা, চিন্তা ও মতামত এক বন্ধুর ও জটিল পথে এগিয়ে চলেছে। শোষিতরা শাসকদের দ্বারা নিষ্পেষিত হতে হতে এককোণে গিয়ে আশ্রয় পেয়েছে। যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' গল্পে রাজাবাহাদুর তার কীপারের মাতৃহীন একটি ছোট্ট শিশুকে

নিয়ে বাঘ শিকারের 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করেন। অমানবিক এই দিকগুলোও সাহিত্যের প্রাঙ্গনে উঠে এসেছে ছোটগল্পকারদের তীক্ষ্ম ধীশক্তির সাহায্যে। যার ফলে পাঠক সমাজ দরিদ্র নিপীড়িতদের দুরবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারছে। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে সমাজ, দেশ, কালের সমস্যা ভাবনার উদ্রেক করলেও আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পগুলো প্রায় সবই সংলাপধর্মী এবং তির্যক বাক্‌ভঙ্গিমাযুক্ত। চোখে দেখা সত্যটাকে চিত্রিত করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুকেই বর্ণনা করেছেন; তাই তা হয়েছে বাহুল্যবর্জিত এবং কথনেও রয়েছে আবশ্যিকতা-অতিকথন সুন্দরভাবে বর্জিত।

গল্পের বিষয়বস্তু, ভাষারীতি পাঠককুলের অতিপরিচিত বলে গল্পের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতময়তা সহজেই সকলকে বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। গল্পের মধ্যে সমস্যাটা ফুটে ওঠার পর গল্পের সমাপ্তিতে যে রেশ রয়ে যায়, তার সূত্র ধরেই পাঠক সমাজ যেন এর সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করে তাদের ভাষায় — এখানেই লেখিকার সার্থকতা। তাই যে সময়ে আধুনিকতার প্রভাবে সব ছোটগল্পকাররা গল্পের আঙ্গিক নিয়ে চিন্তিত তখন অবলীলাক্রমে আশাপূর্ণা দেবী গল্প বলে গেছেন সহজ উপাদান নিয়ে সহজ রীতিতে। তাই স্বচ্ছ ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হিসেবে গল্পের আঙ্গিকও স্বভাবতই বিষয়ানুগ হয়ে ওঠে এবং তা যথেষ্ট সাফল্যও সূচিত করে। আশাপূর্ণা দেবী যুগোপযোগী শব্দও চয়ন করেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর জন্য। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষদের আলাদা ধরন থাকে, অন্তঃপুরের নারীদের উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারে তাঁর জুড়ি মেলা ভার, বিশেষত ছোটগল্পগুলোর ক্ষেত্রে। তাঁর রচনারাজিতে কাব্যিকচেতনা, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, সৌন্দর্যবোধ ও উপমা, রূপকল্পের ব্যবহারও যথেষ্ট রয়েছে। অর্থাৎ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট সচেতনতা চোখে পড়ে। দেশ-কাল ও সমাজের সামগ্রিক পরিস্থিতি আশাপূর্ণা দেবীকে কখনো ভাবাত না, কারণ সমগ্রকে নিয়ে যে সমস্যা — সেই অখণ্ড চিত্রের প্রতি তাঁর কোনকালেই আগ্রহের আতিশয্য ছিল না। তিনি জীবনের একান্ত নিভৃত অঞ্চলের কথা বলতে গিয়ে যেটুকু দেশাত্মবোধের প্রয়োজন পড়ত — সেটুকুই বলেছেন। কারণ, তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা নিজেদের জগতকে শুধুমাত্র চারদেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিলেন, বহির্জগতের ঘটনার টানাপোড়েন, সংগ্রাম, যুদ্ধ, অর্থনীতি, রাজনীতি — কোনকিছুর তাপ-উত্তাপই এইসব চরিত্রদের তাপিত করত না। খিড়কির দরজা থেকে প্রধান ফটক আর ভেতরের আঙিনা — এটুকুই ছিল তাদের জীবনের জানার গণ্ডী। তাই যুদ্ধের প্রভাব এসব স্ত্রী চরিত্রদের ভাবনায় তথা আশাপূর্ণা দেবীর রচনার উদ্দেশ্যতে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং তিনি কোথাও কোথাও দেখিয়েছেন যুদ্ধ লাগার ফলে কোন কোন বাড়িতে উৎসবের আমেজ চলে এসেছে। কারণ, সঠিক কোথায় বোমা পড়বে তা জানতে না পারায় মেয়েরা সব তাদের সন্তান সন্ততিদের নিয়ে চতুর্দিক থেকে এসে শহরে হাজির হয়েছে সমাজে যে ভাঙন বা অবক্ষয় শুরু হয়েছে তার মূলে দেখা দিচ্ছে নারীদের আত্মসুখের প্রবণতা।

একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে সুখ এবং শান্তি প্রায় পাশাপাশি চললেও বাইরের সমাজে তখন লেগে গিয়েছে পরিবর্তনের হাওয়া। সেই তরঙ্গ এসে আঘাত করছে মধ্যবিত্ত জোট সংসারে। আর তখনই বহু অভিভাবক বেষ্টিত সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে স্বাধীন, ছোট্ট, সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে নারীরা। এই আত্মসুখই অতীতের আভিজাত্যবোধকে ভেঙ্গে দিচ্ছে, জন্ম নিচ্ছে স্বজনহীন ছোট্ট ছোট্ট পরিবার। এই স্থানগুলোকেই আশাপূর্ণা দেবী 'প্লট' হিসেবে নিয়েছেন। এই দিকগুলি একদম চিন্তান্বিত করে নি। তাই সকলের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে, একমাত্র আশাপূর্ণা দেবীই অন্দরমহলের নারীদের অন্তরের কথা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে তুলে এনেছেন।

সন্তোষ কুমার ঘোষ এবং বিমল করের মধ্যে যে মৃত্যুচেতনা কাজ করত, তার প্রভাব তাঁদের রচনায় পড়লেও আশাপূর্ণা দেবী কিন্তু মৃত্যুভয়ে ভীত অধিক সন্তানহারা এক বৃদ্ধার কথা লিখেছেন 'ভয়' গল্পে যে নাকি অশীতিপর হয়েও মরতে ভয় পায়। বেঁচে থাকবার আকুলতা রয়েছে তাঁর রচনায়, জীবনকে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েও বাঁচিয়ে রাখতে দেখা গেছে 'অঙ্গার' গল্পে নতুন বৌ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যে দেখা যায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে প্রেমে কেমন আত্মমগ্ন হয়ে গেছেন, কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় যারা এসেছে তারা জীবন সংগ্রামে এক একজন ক্লান্ত বিধ্বস্ত সৈনিক, তাদের প্রকৃতির সৌন্দর্য্যচেতনায় আপ্লুত হবার তাদের সময় বা মানসিকতা কোনটাই নেই। কারণ, তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা প্রত্যেকেই সংসারের জটিল আবর্তে এমনভাবে নিমজ্জিত যে প্রকৃতির প্রতি প্রেম জন্মানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে তরাই ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন অঞ্চল এবং ঘন বনের গভীরতাকে গল্পের মূলকেন্দ্রে আনতে পেরেছেন তার কারণ তিনি এসব অঞ্চলগুলো পরিভ্রমণ করেছেন এবং এদের প্রতি মনের একটা অনবদ্য আকর্ষণ অনুভব করতেন। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী তো একেবারেই আলাদা জগতের অধিবাসী, চারদেওয়ালের মধ্যেকার জীবনযন্ত্রণাকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। বহির্জগতের কোন আকর্ষণ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে নি। যা নাকি মহাশ্বেতা দেবীর সমস্ত বোধকে নাড়া দিয়েছিল। নিজের সমস্ত অসুবিধাকেও উপেক্ষা করে মহাশ্বেতা দেবী ছুটে ছুটে চলে যেতেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে বঞ্চিত নিপীড়িত আদিবাসীরা দিনের পর দিন শোষণ আর বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। এইসব মানুষদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন নানা সংগঠন, তাদের প্রাণে যুগিয়েছেন বল, আর মুখে যুগিয়েছেন ভাষা। এই অসহায়দের জন্য আজও তাঁর প্রচেষ্টা এবং লেখনী সচল রয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীকে কিন্তু আমাদের গৃহাভ্যন্তরের শাশুড়ী-বৌমা-ননদ-ভাজের সংসারের পাঁচ ফোড়নে পাওয়া যায়নি। একজন নারী হলেও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সামগ্রিক ভাবনা তাকে ভাবিত করেছিল। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী যে রক্ষণশীলতার মধ্যে জন্মেছিলেন এবং জীবনযাপন করেছিলেন সেই জালে আবদ্ধ নারীদের বন্ধনদশা থেকে মুক্তির চিন্তাই তাঁর জীবনের সমস্ত বোধকে নাড়া দিয়েছিল। তাই ঘরের ভেতরে বন্দী,

দুর্দশাগ্রস্ত নারীদের কথা, আর চোখের সামনে ঘটে যাওয়া চলমান জীবনের ছবিই চিরকাল আশাপূর্ণা দেবী চিত্রিত করে গিয়েছেন।

তিনি সমসাময়িক লেখক লেখিকাদের মতো নানা ধরনের ফর্ম নিয়ে গবেষণা না করে চারদিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ, দুঃখ, হাসি, অশ্রুকেই সাধারণ মানুষের মনে নানা রঙে চিত্রিত করেছেন। আশাপূর্ণা দেবীর এই ঘর গৃহস্থালী, বৈঠকখানার আড্ডাতেই নিজের দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। পুরাতন জীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি এবং তাঁর সৃষ্ট নারীদের বিদ্রোহিনী মূর্তি সাহিত্যজগতে অম্লানবদনে বিরাজিত। পাণ্ডিত্যের কোনরকম প্রকাশ না ঘটিয়ে সহজ কথাকে অত্যন্ত সহজে বলে গিয়েই আশাপূর্ণা দেবী আজ সকল পাঠক সমাজ, সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে একান্ত আপনার জন, প্রাণের মানুষ হয়ে উঠেছেন।